Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 18-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.132

প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে বৌদ্ধ দর্শন: চার আর্যসত্যের আলোকে এক দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. শুভজিৎ দত্ত, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কুমারগঞ্জ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.08.2026; Accepted: 12.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Digital technologies have become part of everyday life. They shape the way people think, communicate, work and understand themselves. Such changes have many advantages. They have also brought distraction, anxiety, constant comparison, and an ongoing sense of dissatisfaction. In this paper these experiences will be analysed from the philosophical perspective of the Four Noble Truths in Buddhist thought. It does not regard the Four Noble Truths as a religious teaching or a path for personal spirituality alone. Instead, it takes them as a philosophical framework for understanding the ethical and psychological challenges of a technology-driven society. The discussion explores the expressions of craving, attachment and ignorance in the use of social media, algorithmic consumption and the search for online validation. The novelty of this paper is its attempt to re-interpret the Four Noble Truths as a philosophical approach to contemporary digital life. The paper is informative because it connects classical Buddhist philosophy with current technological realities. It argues that an ancient philosophical tradition still has something to say about current forms of suffering, and offers a more mindful way of engaging with technology.

Keywords: Buddhist Philosophy; Four Noble Truths; Dukkha; Avidyā; Nirvāṇa; Mindfulness; Noble Eightfold Path; Digital Life.

প্রযুক্তি আজ মানুষের জীবনের এমন এক অংশ হয়ে উঠেছে, যাকে আলাদা করে ভাবা প্রায় অসম্ভব। ঘুম থেকে ওঠার পর মোবাইল ফোনে চোখ রাখা, কাজের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় কাটানো, এমনকি নিজের পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রেও ডিজিটাল মাধ্যমের উপস্থিতি এখন খুবই স্বাভাবিক। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে দ্রুত, সহজ এবং সংযুক্ত করেছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। এই সুবিধার পাশাপাশি কি মানুষ আরও শান্ত হয়েছে, নাকি নতুন ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে?

চারদিকে তাকালে একটি দ্বৈত বাস্তবতা চোখে পড়ে। একদিকে প্রযুক্তি জ্ঞান, যোগাযোগ এবং সৃজনশীলতার নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। অন্যদিকে উদ্বেগ, একাকীত্ব, তুলনার প্রবণতা, তথ্যের অতিরিক্ত চাপ এবং ডিজিটাল আসক্তিও ক্রমশ বেড়েছে। সামাজিক মাধ্যমে অন্যের জীবন দেখে নিজের জীবনকে অসম্পূর্ণ মনে হওয়া, নোটিফিকেশনের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে থাকা, কিংবা অকারণেই বারবার ফোন হাতে তুলে নেওয়া এখন অনেকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এগুলো কেবল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নয়। এর পেছনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি এবং আত্মপরিচয় সম্পর্কিত গভীর দার্শনিক প্রশ্নও কাজ করে।

এই জায়গাতেই বৌদ্ধ দর্শনের চার আর্যসত্য নতুনভাবে ভাবার সুযোগ দেয়। সাধারণভাবে চার আর্যসত্যকে একটি ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বিষয়টি শুধু ধর্মীয় নয়। মানুষের দুঃখ, সেই দুঃখের

কারণ, দুঃখ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা এবং মুক্তির পথ নিয়ে এটি একটি সুসংগঠিত দার্শনিক বিশ্লেষণও বটে। সেই কারণে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের সংকট বোঝার ক্ষেত্রেও চার আর্যসত্য একটি কার্যকর ব্যাখ্যামূলক কাঠামো হতে পারে।

এই প্রবন্ধে প্রযুক্তিকে একতরফাভাবে সমস্যা বা সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করা হবে না। প্রযুক্তি নিজে নৈতিক বা অনৈতিক নয়। মানুষ তার সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে মানুষের মানসিক অভ্যাস, তৃষ্ণা, আসক্তি, অবিদ্যা এবং সচেতনতার প্রশ্ন। বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে এই বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করলে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের কিছু জটিল দিক হয়তো আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য চার আর্যসত্যকে সমকালীন প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের প্রেক্ষাপটে পুনরায় পাঠ করা। বিশেষভাবে দেখানো হবে, ডিজিটাল যুগে দুঃখ, তৃষ্ণা, অবিদ্যা এবং মুক্তির ধারণাগুলি কীভাবে নতুন অর্থ ধারণ করে। একই সঙ্গে অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি নৈতিক ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে কতটা সহায়ক হতে পারে, সেটিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এখানেই এই গবেষণার প্রধান অবদান নিহিত। এটি চার আর্যসত্যকে কেবল ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে নয়, সমসাময়িক প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের দার্শনিক বিশ্লেষণের একটি জীবন্ত কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছে।

চার আর্যসত্য: বৌদ্ধ দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি:

বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চার আর্যসত্য। গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের পর প্রথম ধর্মদেশনাতেই এই চারটি সত্যের কথা বলা হয়। এগুলো কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয় নয়। মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা এবং দুঃখকে বোঝার একটি দার্শনিক পদ্ধতিও বটে। মানুষের অস্তিত্বকে কীভাবে বোঝা যায়, দুঃখ কেন জন্ম নেয় এবং সেই দুঃখ থেকে মুক্তির পথ কী হতে পারে, চার আর্যসত্য এই প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্রথম আর্যসত্য হলো দুঃখ। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ বলতে শুধু শারীরিক কষ্ট বোঝায় না। জীবনের অসম্পূর্ণতা, অস্থিরতা এবং অপূর্ণতার অনুভূতিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানুষ সুখের মুহূর্তও অনুভব করে। তবু সেই সুখ স্থায়ী নয়। যা আনন্দ দেয়, একসময় তা বদলে যায় কিংবা হারিয়ে যায়। এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই দুঃখের অভিজ্ঞতা লুকিয়ে থাকে। তাই দুঃখকে কেবল হতাশাবাদ হিসেবে দেখলে বৌদ্ধ দর্শনের মূল বক্তব্য ধরা যায় না। এটি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় আর্যসত্য হলো সমুদয়। এখানে দুঃখের কারণ হিসেবে তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে। মানুষ শুধু প্রয়োজন মেটাতে চায় না। সে আরও চায়, আরও ধরে রাখতে চায় এবং যা অপছন্দ করে তা দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এই আকর্ষণ ও বিরাগের চক্র থেকেই নানা ধরনের বন্ধন তৈরি হয়। তৃষ্ণা তাই কেবল ভোগের আকাঙ্ক্ষা নয়। পরিচয়, ক্ষমতা, স্বীকৃতি এবং স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষাও এর অংশ। মানুষের মন এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

তৃতীয় আর্যসত্য হলো নিরোধ। বৌদ্ধ দর্শন মনে করে দুঃখের কারণ দূর করা সম্ভব হলে দুঃখেরও অবসান সম্ভব। নিরোধ কোনো অলৌকিক অবস্থা নয়। এটি এমন এক মানসিক রূপান্তরের কথা বলে, যেখানে মানুষ তৃষ্ণা ও আসক্তির বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে শেখে। এই মুক্তি বাইরের পৃথিবী ত্যাগ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিজের মনকে নতুনভাবে বোঝার মধ্যেও এর সূচনা ঘটে।

চতুর্থ আর্যসত্য হলো মার্গ। এটি দুঃখনিরোধের বাস্তব পথ নির্দেশ করে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধির কথা বলা হয়েছে। এই পথ কোনো কঠোর নিয়মের তালিকা নয়। এটি এমন একটি জীবনচর্চা, যেখানে নৈতিকতা, প্রজ্ঞা এবং মানসিক শৃঙ্খলা পরস্পরকে সম্পূরক করে।

চার আর্যসত্যকে আলাদা চারটি ধারণা হিসেবে দেখলে তাদের গভীরতা পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এগুলো একটি ধারাবাহিক দার্শনিক কাঠামো গঠন করে। প্রথমে মানুষের অভিজ্ঞতার বাস্তবতা চিহ্নিত করা হয়। তারপর সেই বাস্তবতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এরপর মুক্তির সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। সবশেষে সেই মুক্তির পথ নির্দেশ করা হয়। এই যৌক্তিক বিন্যাসই চার আর্যসত্যকে শুধু ধর্মীয় উপদেশের সীমায় রাখে না। এটি মানবজীবনের একটি বিশ্লেষণাত্মক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বৌদ্ধ দর্শনে মানুষের নিজের ভূমিকার ওপরও জোর দেয়। এই প্রসঙ্গে Walpola Rahula বলেছেন,

> "Man's position, according to Buddhism, is supreme. Man is his own master, and there is no higher being or power that sits in judgment over his destiny" (Rahula, 1974, p. 1)।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে মানুষের জীবনযাত্রা বদলেছে, কিন্তু মানুষের মন সম্পূর্ণ বদলে যায়নি। আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, ভয় এবং অস্থিরতা এখনও মানুষের অভিজ্ঞতার অংশ। শুধু তাদের প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে। সেই কারণেই চার আর্যসত্য আজও প্রাসঙ্গিক। সমকালীন প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের নানা সংকটকে বোঝার জন্য এটি একটি কার্যকর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। পরবর্তী আলোচনায় সেই সম্পর্কই ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে দুঃখের স্বরূপ:

বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম আর্যসত্য হলো দুঃখ। এই ধারণা অনেক সময় ভুল বোঝা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, বৌদ্ধ দর্শন শুধু জীবনের নেতিবাচক দিক নিয়ে কথা বলে। বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয়। এখানে দুঃখ বলতে এমন এক মানবিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেখানে স্থায়ী সন্তুষ্টি অধরা থেকে যায়। মানুষ সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু সেই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পরিবর্তন, অনিশ্চয়তা এবং অপূর্ণতার অনুভূতি বারবার ফিরে আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্তিনির্ভর জীবনকে বোঝার ক্ষেত্রেও নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে।

প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে অনেক সহজ করেছে। তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ এবং কর্মক্ষেত্রে এর অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়। জরুরি তথ্য মুহূর্তেই পাওয়া যায়। অনেক কাজ এখন ঘরে বসেই সম্পন্ন করা সম্ভব। এসব পরিবর্তন মানুষের জীবনকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে গেছে।

তবু বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য একটি দিকও দেখায়। প্রযুক্তির ব্যবহার যত বেড়েছে, মানুষের মানসিক চাপও তত কমেনি। অনেক ক্ষেত্রে তা নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ সময় কাটানোর পরও অনেক মানুষ একাকীত্ব অনুভব করেন। শত শত মানুষের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত থেকেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব অনুভূত হয়। ডিজিটাল সংযোগ সব সময় মানসিক সংযোগে রূপ নেয় না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তুলনার প্রবণতা। সামাজিক মাধ্যমে মানুষ সাধারণত নিজের জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলোই প্রকাশ করে। সেই নির্বাচিত ছবিগুলো দেখে অন্যের জীবনকে নিখুঁত মনে হতে পারে। তখন নিজের জীবনকে কম সফল বা কম আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এই তুলনা অনেক সময় অজান্তেই

আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করে। মানুষ বুঝতেও পারে না, সে বাস্তব মানুষের সঙ্গে নয়, একটি বাছাই করা ডিজিটাল পরিচয়ের সঙ্গে নিজের তুলনা করছে।

নোটিফিকেশন, নতুন তথ্য এবং অবিরাম আপডেটের প্রবাহও মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। অনেকেই অকারণে বারবার ফোন হাতে নেন। নতুন কিছু এসেছে কি না, কেউ বার্তা পাঠিয়েছে কি না, কিংবা কোনো পোস্টে প্রতিক্রিয়া এসেছে কি না, এই কৌতূহল ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হয়। বিষয়টি শুধু সময় নষ্টের সমস্যা নয়। মনোযোগ ভেঙে যাওয়া, অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ সময় একাগ্র থাকতে না পারার সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে।

বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে দেখলে, এগুলোকে শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যা বলা যথেষ্ট নয়। এগুলো মানুষের অভিজ্ঞতার এমন কিছু রূপ, যেখানে দুঃখ নতুনভাবে প্রকাশ পায়। প্রযুক্তি এখানে দুঃখের একমাত্র কারণ নয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা এবং মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে প্রযুক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় দুঃখের অভিজ্ঞতাও নতুন মাত্রা পায়। একই প্রযুক্তি একজন মানুষের জন্য জ্ঞানের উৎস হতে পারে, আবার অন্যজনের জন্য উদ্বেগের কারণও হতে পারে।

তাই প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের দুঃখকে বোঝার জন্য কেবল প্রযুক্তির সমালোচনা যথেষ্ট নয়। মানুষের মন কীভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেই প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম আর্যসত্য আজও প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বাহ্যিক পরিবর্তনের মধ্যেও মানুষের মৌলিক মানসিক সংকট অনেকাংশে একই রয়ে গেছে। প্রযুক্তি সেই সংকটের রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারে না। পরবর্তী অংশে এই দুঃখের উৎস আরও গভীরভাবে আলোচিত হবে। বিশেষভাবে তৃষ্ণা, আসক্তি এবং ডিজিটাল আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে, যা বৌদ্ধ দর্শনের দ্বিতীয় আর্যসত্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

তৃষ্ণা, আসক্তি ও ডিজিটাল আকাঙ্ক্ষা:

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের মূল কারণ হিসেবে তৃষ্ণা বা *তণ্হা*কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃষ্ণা বলতে শুধু বস্তুগত ভোগের ইচ্ছা বোঝায় না। এটি এমন এক মানসিক প্রবণতা, যা মানুষকে সব সময় আরও কিছু পাওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। কখনও মানুষ সুখ ধরে রাখতে চায়। কখনও নিজের অবস্থান বদলাতে চায়। আবার কখনও এমন কিছু থেকে পালাতে চায়, যা তাকে অস্বস্তি দেয়। এই অবিরাম চাওয়ার মধ্যেই তৃষ্ণার প্রকৃতি নিহিত।

ডিজিটাল যুগে তৃষ্ণার এই রূপ আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি বা মতামত প্রকাশ করার পর অনেকেই প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকেন। কতজন পছন্দ করল, কতজন মন্তব্য করল, কিংবা কতবার শেয়ার হলো, এসব সংখ্যা অনেক সময় নিজের মূল্যায়নের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাগুলো ছোট হলেও তাদের মানসিক প্রভাব সব সময় ছোট থাকে না। স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে নির্ভরশীলতায় পরিণত হতে পারে।

এই প্রবণতার সঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নকশারও সম্পর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর মনোযোগ যত বেশি সময় ধরে রাখা যায়, তত বেশি লাভবান হয়। তাই নতুন ভিডিও, নতুন খবর, নতুন বিজ্ঞপ্তি কিংবা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী সাজানো বিষয়বস্তু একের পর এক সামনে আসে। ব্যবহারকারী মনে করেন তিনি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই নির্বাচন অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। ফলে আকাঙ্ক্ষার চক্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বৌদ্ধ দর্শন আকাঙ্ক্ষার সব রূপকে সমানভাবে নাকচ করে না। জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা, নৈতিক জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কিংবা অন্যের কল্যাণ কামনা তৃষ্ণার সমার্থক নয়। সমস্যার শুরু হয় তখন, যখন আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে এবং মানসিক শান্তিকে নির্ভরশীল করে তোলে। ডিজিটাল পরিবেশে এই সীমারেখা অনেক সময় অস্পষ্ট হয়ে যায়। কাজের প্রয়োজনেই কেউ সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার শুরু করেন। পরে সেটিই অজান্তে অভ্যাস বা আসক্তিতে রূপ নিতে পারে।

আসক্তি সব সময় নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পায় না। অনেক সময় তা খুব সাধারণ আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। কয়েক মিনিটের জন্য ফোন দেখার ইচ্ছা কখন এক ঘণ্টায় গড়ায়, তা টের পাওয়া যায় না। কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োজন না থাকলেও মানুষ বারবার একই অ্যাপ খুলে দেখেন। অনেকেই পরে উপলব্ধি করেন, এই কাজটি সচেতন সিদ্ধান্তের চেয়ে অভ্যাসের ফল ছিল। বৌদ্ধ দর্শনের ভাষায় বলা যায়, তৃষ্ণা তখন মানুষের আচরণকে নিঃশব্দে পরিচালিত করতে শুরু করে।

ডিজিটাল ভোগবাদও এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনলাইন বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত পছন্দভিত্তিক সুপারিশ এবং দ্রুত কেনাকাটার সুযোগ মানুষের চাওয়াকে ক্রমাগত উসকে দেয়। একটি পণ্য কেনার পর খুব দ্রুত আরেকটি নতুন পণ্যের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। সন্তুষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নতুন আকাঙ্ক্ষা আবার পুরোনো আকাঙ্ক্ষার জায়গা দখল করে। এই চক্রের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত তৃষ্ণার ধারণার একটি স্পষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অবশ্য প্রযুক্তিকে একমাত্র দায়ী বলা ঠিক হবে না। একই প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা এবং সৃজনশীল কাজের জন্যও ব্যবহৃত হয়। পার্থক্য তৈরি হয় মানুষের ব্যবহার, মানসিক অভ্যাস এবং সচেতনতার স্তরে। তাই সমস্যার মূল প্রযুক্তির অস্তিত্বে নয়, প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ধরনে।

এই আলোচনায় দেখা গেল, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে তৃষ্ণা ও আসক্তি নতুন রূপে প্রকাশ পেলেও তাদের মৌলিক প্রকৃতি খুব বেশি বদলায়নি। মানুষের মন এখনও স্বীকৃতি, নিরাপত্তা, আনন্দ এবং স্থায়িত্বের সন্ধান করে। ডিজিটাল পরিবেশ সেই অনুসন্ধানকে আরও দ্রুত এবং আরও তীব্র করে তুলেছে। বৌদ্ধ দর্শনের দ্বিতীয় আর্যসত্য তাই সমকালীন ডিজিটাল সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য একটি গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। পরবর্তী অংশে আলোচনার কেন্দ্র হবে অবিদ্যা। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে আত্মপরিচয়, বাস্তবতা এবং ভার্চুয়াল সত্তার সম্পর্ক কীভাবে নতুন সংকট সৃষ্টি করছে, তা বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

অবিদ্যা ও প্রযুক্তিনির্ভর আত্মপরিচয়ের সংকট:

বৌদ্ধ দর্শনে তৃষ্ণার আরও গভীরে রয়েছে অবিদ্যা। অবিদ্যা বলতে সাধারণ অর্থে তথ্যের অভাব বোঝায় না। একজন মানুষ অনেক জ্ঞান অর্জন করেও অবিদ্যার মধ্যে থাকতে পারেন। এখানে অবিদ্যা বলতে বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ভুল ধারণাকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ যখন অনিত্যকে নিত্য, পরিবর্তনশীলকে স্থায়ী কিংবা অনাত্মকে আত্মা বলে ধরে নেয়, তখন সেই ভুল বোঝাপড়া থেকেই তৃষ্ণা ও দুঃখের জন্ম হয়।

প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে এই প্রশ্নটি নতুনভাবে সামনে আসে। আজ তথ্যের অভাব নেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যেকোনো বিষয়ে অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায়। তবু তথ্যের প্রাচুর্য সব সময় প্রজ্ঞার জন্ম দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তথ্য মানুষের বিচারক্ষমতাকে আরও বিভ্রান্ত করে। সত্য, মতামত এবং প্রচারণার সীমারেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষ তথ্যের মধ্যে থেকেও বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রত্যেকে নিজের একটি পরিচয় নির্মাণ করে। সেই পরিচয় অনেক সময় বাস্তব জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে না। মানুষ নিজের সফলতা, আনন্দ এবং সুন্দর মুহূর্তগুলোই বেশি তুলে ধরে। ব্যর্থতা, একাকীত্ব কিংবা অনিশ্চয়তা প্রায়ই আড়ালে থেকে যায়। ফলে একটি পরিমার্জিত ডিজিটাল সত্তা তৈরি হয়, যা বাস্তব মানুষটির সম্পূর্ণ প্রতিফলন নয়।

সমস্যা তখনই গভীর হয়, যখন মানুষ এই নির্মিত পরিচয়ের সঙ্গেই নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। অনলাইনে প্রশংসা পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সমালোচনা বা উপেক্ষা পেলে আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়। ধীরে ধীরে নিজের মূল্যবোধ বাইরের প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। বৌদ্ধ দর্শনের ভাষায় বলা যায়, আত্মপরিচয় তখন একটি পরিবর্তনশীল নির্মাণের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই আবদ্ধতাই নতুন ধরনের মানসিক অস্থিরতার জন্ম দেয়। পরিচয় ও মানসিক আবদ্ধতার এই প্রশ্নটি Walpola Rahula-এর আলোচনায় আরও গভীর অর্থ পায়।

> "When, for instance, we meet a man, we do not look on him as a human being, but we put a label on him, such as English, French, German, American, or Jew, and regard him with all the prejudices associated with that label in our mind" (Rahula, 1974, p. 5).

এখানে মূল সমস্যাটি শুধু পরিচয় নয়, পরিচয়ের সঙ্গে মানসিকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়া। ডিজিটাল পরিবেশে এই প্রবণতা আরও সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়। অনলাইনে গড়ে ওঠা পরিচয় ও ভাবমূর্তির সঙ্গে মানুষ নিজের আত্মমূল্যকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। ফলে একটি পরিবর্তনশীল ডিজিটাল পরিচয় ধীরে ধীরে স্থায়ী আত্মপরিচয়ের মতো মনে হতে থাকে। বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিতে এখানেই অবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পায়।

অবিদ্যার আরেকটি প্রকাশ দেখা যায় নিয়ন্ত্রণের ধারণায়। প্রযুক্তি মানুষকে এমন অনুভূতি দিতে পারে যে সবকিছু হাতের নাগালে রয়েছে। একটি ক্লিকেই তথ্য, বিনোদন, কেনাকাটা কিংবা যোগাযোগ সম্ভব। কিন্তু জীবনের মৌলিক অনিশ্চয়তা এতে দূর হয় না। অসুস্থতা, বিচ্ছেদ, মৃত্যু কিংবা সম্পর্কের জটিলতা এখনও মানুষের জীবনের অংশ। প্রযুক্তি এসব অভিজ্ঞতার রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারে না। এই সীমাবদ্ধতা ভুলে গেলে মানুষ প্রযুক্তির কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা করতে শুরু করে, যা কখনও পূরণ হওয়ার নয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল বাস্তবতা এবং ডিজিটাল অবতারের বিস্তার এই আলোচনাকে আরও জটিল করেছে। মানুষ এখন নিজের বিকল্প ডিজিটাল পরিচয় তৈরি করতে পারে। অনেক কাজ যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এতে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে একটি প্রশ্নও উঠে আসে। প্রযুক্তি কি মানুষের পরিচয়কে আরও সমৃদ্ধ করছে, নাকি মানুষ ধীরে ধীরে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। তবে বৌদ্ধ দর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যেকোনো পরিচয়ই পরিবর্তনশীল। সেটিকে স্থায়ী বলে ধরে নিলেই বিভ্রান্তি শুরু হয়।

অবিদ্যার আলোচনায় আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি নিজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না। একই প্রযুক্তি একজন গবেষকের জন্য জ্ঞানের উৎস হতে পারে, আবার অন্য কারও জন্য অবিরাম বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। তাই সমস্যার কেন্দ্র প্রযুক্তি নয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক অভ্যাস এবং বাস্তবতাকে বোঝার পদ্ধতিই এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই কারণেই বৌদ্ধ দর্শনে অবিদ্যা শুধু জ্ঞানের অভাব নয়, ভুল উপলব্ধির নাম। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে এই ভুল উপলব্ধি অনেক সময় আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। মানুষ তথ্যে ঘেরা থেকেও নিজেকে ভুলভাবে চিনতে পারে। বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ রেখেও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত থাকতে পারে। তাই অবিদ্যার প্রশ্ন আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এটি প্রযুক্তির নয়, মানুষের চেতনার প্রশ্ন। পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে দুঃখনিরোধ নিয়ে। বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে প্রযুক্তির সঙ্গে আরও সচেতন, সংযত এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনা সেখানে অনুসন্ধান করা হবে।

দুঃখনিরোধ: প্রযুক্তির সঙ্গে সচেতন সম্পর্কের সম্ভাবনা:

বৌদ্ধ দর্শনের তৃতীয় আর্যসত্য হলো দুঃখনিরোধ। এর মূল বক্তব্য আশাবাদী। দুঃখ যদি কারণনির্ভর হয়, তবে সেই কারণ দূর হলে দুঃখও দূর হতে পারে। এখানে নিরোধ বলতে জীবনের সব সমস্যা একদিন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না। বিষয়টি মানুষের মানসিক রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তৃষ্ণা, আসক্তি এবং অবিদ্যার প্রভাব কমতে শুরু করলে মানুষ দুঃখের সঙ্গে ভিন্নভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখে। এই মুক্তির ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Satischandra Chatterjee এবং Dhirendramohan Datta লিখেছেন,

> "The result of this unhampered concentration on truth is perfect insight or wisdom, to which the riddle of existence stands clearly revealed once for all. Ignorance and desire are cut at their roots and the source of misery vanishes. Perfect wisdom, perfect goodness and perfect equanimity-complete relief from suffering - are simultaneously attained, therefore, in nirvāṇa" (Chatterjee & Datta, 2012, p. 123).

প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ক্ষেত্রেও এই ভাবনা অর্থবহ। প্রযুক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া আজ বাস্তবসম্মত নয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, প্রশাসন এবং যোগাযোগের মতো বহু ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি অপরিহার্য। তাই প্রশ্নটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত কি না, সেটি নয়। প্রশ্ন হলো, মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, নাকি প্রযুক্তিই ধীরে ধীরে মানুষের অভ্যাস ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এই জায়গায় সচেতনতার গুরুত্ব বাড়ে। মানুষ যখন কোনো কাজ অভ্যাসবশত করে, তখন অনেক সময় নিজের আচরণ সম্পর্কে সে সচেতন থাকে না। যেমন, কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়াই বারবার ফোন হাতে নেওয়া, অবিরাম ভিডিও দেখে সময় কাটানো, কিংবা কাজের মাঝেও বারবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফিরে যাওয়া। এসব আচরণ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এগুলোর অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত নয়। এগুলো অভ্যাসের ফল।

বৌদ্ধ দর্শনের মননশীলতা এই অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। মননশীলতা মানে প্রযুক্তিকে অস্বীকার করা নয়। এটি নিজের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণের প্রতি সজাগ থাকা। একজন মানুষ যদি বুঝতে পারেন কেন তিনি একটি নির্দিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন, কত সময় ব্যয় করছেন এবং সেই ব্যবহার তার মানসিক অবস্থাকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তবে প্রযুক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে। নির্বাণের ধারণার মধ্যেও এই মানসিক প্রশান্তি ও মুক্তির বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। Hiriyanna-এর ব্যাখ্যায়,

> "That is nirvāṇa in the sense of 'blowing out,' while the state of the arahant, which marks the transition from common life to it,

> corresponds to the other meaning of the word, viz. 'becoming cool'" (Hiriyanna, 2014, p. 153).

সচেতন ব্যবহার মানে কঠোর নিয়ন্ত্রণও নয়। কেউ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন। কেউ কাজের সময় অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন বন্ধ রাখতে পারেন। আবার কেউ দিনে কিছু সময় সম্পূর্ণ অফলাইনে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। এসব পদক্ষেপ ছোট মনে হলেও এগুলো মানুষের মনোযোগ এবং মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনের ভাষায় এগুলো সংযম ও সচেতনতার অনুশীলনের অংশ।

তবে এখানেও একটি সতর্কতা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সব দায় ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বর্তমান ডিজিটাল পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে ব্যবহারকারী যত বেশি সময় অনলাইনে থাকেন। অ্যালগরিদম, নোটিফিকেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুপারিশ এই উদ্দেশ্যেই কাজ করে। তাই প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের সংকট বুঝতে হলে ব্যক্তিগত অভ্যাসের পাশাপাশি প্রযুক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকেও বিবেচনায় আনতে হবে।

তবু ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শন মানুষকে বাহ্যিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক বলে মনে করে না। আবার তাকে সম্পূর্ণ অসহায়ও মনে করে না। মানুষ নিজের মন, অভ্যাস এবং প্রতিক্রিয়ার ওপর ধীরে ধীরে কাজ করতে পারে। এই পরিবর্তন একদিনে আসে না। এটি নিয়মিত অনুশীলনের ফল।

এই অর্থে দুঃখনিরোধ প্রযুক্তি থেকে পালিয়ে যাওয়ার আহ্বান নয়। এটি প্রযুক্তির সঙ্গে আরও পরিণত, সংযত এবং সচেতন সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান। মানুষের ভেতরের পরিবর্তন ছাড়া বাহ্যিক পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বৌদ্ধ দর্শনের এই অন্তর্দৃষ্টি আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, মানুষের মানসিক শান্তি শেষ পর্যন্ত তার নিজের সচেতনতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবে শুধু সচেতনতা যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে নৈতিক ও দায়িত্বশীল হতে পারে, সেই প্রশ্নটিও সামনে আসে। এখানেই অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধারণাটি নতুনভাবে ভাবার সুযোগ তৈরি করে। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম এবং সম্যক স্মৃতির মতো ধারণাগুলো ডিজিটাল জীবনের নানা আচরণকে বিচার করার একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে। তাই পরবর্তী আলোচনায় অষ্টাঙ্গিক মার্গের আলোকে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের নৈতিক দিকটি বিবেচনা করা হবে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের নৈতিকতা:

দুঃখনিরোধের সম্ভাবনা দেখানোর পর বৌদ্ধ দর্শন অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলে। এটি কোনো কঠোর বিধিনিষেধের তালিকা নয়। মানুষের চিন্তা, আচরণ এবং জীবনযাপনের একটি নৈতিক ও ব্যবহারিক পথনির্দেশ। এই পথের উদ্দেশ্য মানুষকে এমন একটি জীবনচর্চার দিকে নিয়ে যাওয়া, যেখানে প্রজ্ঞা, সংযম এবং সহমর্মিতা একসঙ্গে বিকশিত হয়। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজেও এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব কমে যায়নি। এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রয়েছে বুদ্ধের মধ্যমার্গের ধারণা। Sharma-এর ভাষায়,

> "Buddha's ethical 'middle path' is like the 'golden mean' of Aristotle. Self-indulgence and self-mortification are equally ruled out" (Sharma, 2016, p. 72).

অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম উপাদান হলো সম্যক দৃষ্টি। এর অর্থ বাস্তবতাকে যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে বোঝার চেষ্টা করা। ডিজিটাল যুগে এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্য সব সময় সত্য নয়। অনেক তথ্য অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে। তাই কোনো তথ্য গ্রহণ বা প্রচার করার আগে সমালোচনামূলকভাবে যাচাই করা সম্যক দৃষ্টির একটি সমকালীন প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সম্যক সংকল্পও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি ব্যবহার করার পেছনে মানুষের উদ্দেশ্য কী, সেই প্রশ্নটি সহজ হলেও গভীর। কেউ যদি জ্ঞান অর্জন, সৃজনশীলতা বা অর্থবহ যোগাযোগের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, তবে তার অভিজ্ঞতা এক রকম হবে। অন্যদিকে, যদি ব্যবহার কেবল স্বীকৃতি অর্জন, প্রতিযোগিতা বা অবিরাম বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার মানসিক প্রভাবও ভিন্ন হবে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের নৈতিকতা অনেকাংশে মানুষের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক বাক্ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ডিজিটাল যুগে এই শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমে মানুষ খুব দ্রুত মতামত প্রকাশ করেন। অনেক সময় না ভেবেই কটু মন্তব্য, বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা কিংবা ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। একটি মন্তব্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তাই অনলাইন যোগাযোগেও সত্যবাদিতা, সংযম এবং সম্মানবোধ বজায় রাখা একটি নৈতিক দায়িত্ব।

সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকার ধারণাও নতুনভাবে ভাবার সুযোগ দেয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতারণা, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার বা বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানো শুধু আইনগত সমস্যা নয়। এটি নৈতিক সমস্যাও। একইভাবে প্রযুক্তি যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গবেষণা বা সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তবে তা মানুষের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে প্রযুক্তির নৈতিক মূল্য অনেকাংশে তার ব্যবহারের ধরন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ তিনটি উপাদান, অর্থাৎ সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি মানুষের মানসিক অনুশীলনের ওপর জোর দেয়। বর্তমান ডিজিটাল পরিবেশে মনোযোগ ধরে রাখা আগের তুলনায় কঠিন হয়ে উঠেছে। অবিরাম নোটিফিকেশন, দ্রুত বদলে যাওয়া তথ্য এবং ক্ষণস্থায়ী বিষয়বস্তু মানুষের মনকে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে টেনে নিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে মনোযোগ ধরে রাখা এবং সচেতনভাবে কাজ করার ক্ষমতা নিজেই একটি মূল্যবান অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

তবে বৌদ্ধ নৈতিকতাকে প্রযুক্তির ওপর সরাসরি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা দরকার। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির অস্তিত্ব ছিল না। তাই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে আধুনিক প্রযুক্তির জন্য তৈরি কোনো ব্যবহারবিধি হিসেবে পড়া ঠিক হবে না। তবে এর মৌলিক নৈতিক নীতিগুলো, যেমন সত্যবাদিতা, সংযম, সচেতনতা এবং করুণা, আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজেও নতুন অর্থে প্রয়োগ করা সম্ভব। এখানেই বৌদ্ধ দর্শনের দীর্ঘস্থায়ী শক্তি নিহিত।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রযুক্তির বিরোধিতা করে না। এটি মানুষকে প্রযুক্তির সঙ্গে আরও দায়িত্বশীল, সচেতন এবং নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। আবার অসচেতন ব্যবহারে সেটিই দুঃখের উৎস হয়ে উঠতে পারে। কোন সম্ভাবনাটি বাস্তব হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিক অনুশীলনের ওপর। এখন

আমরা পুরো আলোচনাকে একত্রে বিবেচনা করে চার আর্যসত্যের আলোকে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের একটি সমালোচনামূলক পুনর্বিবেচনা উপস্থাপন করব।

চার আর্যসত্যের আলোকে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের দার্শনিক পুনর্মূল্যায়ন:

এ পর্যন্ত আলোচনায় চার আর্যসত্যের প্রতিটি দিক প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বৌদ্ধ দর্শন কেবল অতীতের একটি দার্শনিক ঐতিহ্য নয়। সমকালীন প্রযুক্তিনির্ভর সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রেও এটি একটি অর্থবহ ব্যাখ্যামূলক কাঠামো প্রদান করে। মানুষের জীবনযাত্রা বদলেছে, প্রযুক্তির ধরন বদলেছে, কিন্তু মানুষের মনকে ঘিরে থাকা অনেক মৌলিক প্রশ্ন এখনও একই রয়ে গেছে।

চার আর্যসত্যের প্রথম শিক্ষা আমাদের দুঃখের বাস্তবতাকে স্বীকার করতে শেখায়। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত করেছে। তবু উদ্বেগ, একাকীত্ব, মানসিক ক্লান্তি এবং আত্মপরিচয়ের সংকট পুরোপুরি দূর হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাগুলো নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানেই মানবিক পরিতৃপ্তি, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ নয়।

দ্বিতীয় আর্যসত্য প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের একটি গভীর দিক উন্মোচন করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন বাজার এবং অ্যালগরিদমভিত্তিক ডিজিটাল পরিবেশ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমাগত সক্রিয় রাখে। নতুন কিছু দেখার, আরও জানার, আরও পাওয়ার এবং অন্যের স্বীকৃতি অর্জনের প্রবণতা অনেক সময় শেষ হয় না। বৌদ্ধ দর্শনের ভাষায় এই প্রবণতাগুলো তৃষ্ণার আধুনিক প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রযুক্তিই তৃষ্ণা সৃষ্টি করে। প্রযুক্তি মূলত মানুষের বিদ্যমান মানসিক প্রবণতাগুলোকে আরও দৃশ্যমান এবং তীব্র করে তোলে।

অবিদ্যার ধারণাও এই আলোচনায় নতুন গুরুত্ব লাভ করে। তথ্যের সহজলভ্যতা সব সময় সত্যের উপলব্ধি নিশ্চিত করে না। একইভাবে ডিজিটাল পরিচয় সব সময় মানুষের বাস্তব পরিচয়ের প্রতিফলন নয়। মানুষ অনেক সময় নিজের নির্মিত অনলাইন সত্তার সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে পড়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রদর্শিত পরিচয়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। এই অবস্থাকে বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে ভুল উপলব্ধির একটি সমকালীন রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

চার আর্যসত্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দিক এই আলোচনায় একটি ইতিবাচক সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরে। প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যেমন বাস্তবসম্মত নয়, তেমনি তাকে জীবনের একমাত্র ভরসা হিসেবে গ্রহণ করাও যুক্তিযুক্ত নয়। সচেতনতা, সংযম এবং নৈতিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে প্রযুক্তির সঙ্গে আরও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। সত্যনিষ্ঠা, সংযত আচরণ, মনোযোগ এবং সহমর্মিতার মতো মূল্যবোধ ডিজিটাল যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক।

তবে বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনারও কিছু সীমা রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের সব সমস্যাকে ব্যক্তিগত মানসিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা আড়ালে থেকে যেতে পারে। প্রযুক্তি কোম্পানির নীতি, তথ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার, অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোও মানুষের ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, উভয় স্তরেই বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সব দিক বিবেচনা করলে বলা যায়, চার আর্যসত্য আজও একটি জীবন্ত দার্শনিক কাঠামো। এটি প্রযুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সরল অবস্থান গ্রহণ করে না। মানুষের অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা, চেতনা এবং নৈতিকতার আলোকে প্রযুক্তিকে বোঝার একটি গভীর পথ উন্মুক্ত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রযুক্তির প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে মানুষ তার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক গড়ে তোলে। বাহ্যিক উন্নয়নের পাশাপাশি অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মসচেতনতার বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে এই ভারসাম্য রক্ষা করাই সম্ভবত বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

উপসংহার:

প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ মানুষের জীবনকে অভূতপূর্বভাবে পরিবর্তন করেছে। যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গবেষণা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। একই সঙ্গে এই পরিবর্তন মানুষের মানসিক জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। উদ্বেগ, ডিজিটাল আসক্তি, আত্মপরিচয়ের সংকট, অবিরাম তুলনা এবং মনোযোগের বিচ্ছিন্নতা আজ অনেকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ। তাই প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়নের সময় শুধু এর সুবিধা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট নয়। মানুষের অভিজ্ঞতা ও চেতনার প্রশ্নও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

এই প্রবন্ধে চার আর্যসত্যের আলোকে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনায় দেখা গেছে, বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখ, তৃষ্ণা, অবিদ্যা, নিরোধ এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধারণাগুলো সমকালীন ডিজিটাল জীবনের নানা দিক ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা, স্বীকৃতির প্রত্যাশা এবং ভার্চুয়াল পরিচয়ের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে নতুনভাবে প্রকাশ পেলেও, তাদের দার্শনিক ভিত্তি বহু আগে থেকেই বৌদ্ধ দর্শনে আলোচিত হয়েছে।

এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে চার আর্যসত্যকে কেবল ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এগুলোকে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের নৈতিক, মানসিক এবং দার্শনিক সংকট বোঝার একটি বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো হিসেবে পুনরায় পাঠ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পুনর্মূল্যায়ন দেখায় যে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে অর্থবহ সংলাপ গড়ে তুলতে সক্ষম। সেই অর্থে চার আর্যসত্য শুধু অতীতের একটি ঐতিহাসিক ধারণা নয়। এটি বর্তমানের জটিল মানবিক অভিজ্ঞতা বোঝার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।

তবে এই আলোচনার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের সব সমস্যার ব্যাখ্যা শুধুমাত্র বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রযুক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ গবেষণায় বৌদ্ধ দর্শনের পাশাপাশি অন্যান্য দার্শনিক ঐতিহ্য, যেমন অস্তিত্ববাদ, প্রপঞ্চবাদ বা সমালোচনামূলক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, প্রযুক্তি আজ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর উপস্থিতি স্পষ্ট। ভবিষ্যতে এই নির্ভরতা আরও বাড়বে বলেই মনে হয়। তাই প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা যেমন বাস্তবসম্মত নয়, তেমনি এটিকে মানবজীবনের সব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসেবেও দেখা যায় না। মানুষের শান্তি, প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তির সক্ষমতার বাইরে গিয়ে মানুষের নিজস্ব চেতনা, মূল্যবোধ এবং জীবনদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ দর্শনের চার আর্যসত্য নতুন তাৎপর্য লাভ করে। এগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের দুঃখের মূল কারণ কেবল বাহ্যিক পরিস্থিতি নয়, মানুষের মানসিক প্রবণতা, আকাঙ্ক্ষা এবং ভুল উপলব্ধিও এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রযুক্তি সেই প্রবণতাগুলোকে কখনও তীব্র করে তোলে, কখনও নতুন রূপ দেয়, কিন্তু সেগুলোর মূল উৎস সৃষ্টি করে না। তাই প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের সংকট বুঝতে হলে মানুষের অন্তর্জগতের দিকেও সমান মনোযোগ দিতে হবে।

বৌদ্ধ দর্শন প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানায় না। আবার প্রযুক্তির প্রতি অন্ধ নির্ভরতারও সমর্থন করে না। এর পরিবর্তে এটি এমন একটি জীবনদৃষ্টির কথা বলে, যেখানে সচেতনতা, সংযম, নৈতিক দায়িত্ব এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ প্রযুক্তির সঙ্গে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এই ভারসাম্য কেবল ব্যক্তিগত মানসিক শান্তির জন্য নয়, আরও মানবিক ও দায়িত্বশীল ডিজিটাল সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থে বলা যায়, প্রযুক্তিনির্ভর যুগে চার আর্যসত্য শুধু একটি প্রাচীন দার্শনিক শিক্ষা নয়। এটি সমকালীন মানবজীবনের জটিল প্রশ্নগুলোকে নতুনভাবে ভাবার একটি অর্থবহ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই কারণেই এর প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Chatterjee, S. C., & Datta, D. M. (2012). An introduction to Indian philosophy. University of Calcutta.
2. Gethin, R. (1998). The foundations of Buddhism. Oxford University Press.
3. Harvey, P. (2013). An introduction to Buddhism: Teachings, history and practices (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. Hiriyanna, M. (2014). Outlines of Indian philosophy. Motilal Banarsidass.
5. Keown, D. (2001). Buddhism and bioethics. Palgrave.
6. Lopez, D. S., Jr. (2001). The story of Buddhism: A concise guide to its history and teachings. HarperSanFrancisco.
7. McMahan, D. L. (2008). The making of Buddhist modernism. Oxford University Press.
8. Nyanatiloka. (2004). Buddhist dictionary: Manual of Buddhist terms and doctrines (4th ed.). Buddhist Publication Society.
9. Rahula, W. (1974). What the Buddha taught (Rev. ed.). Grove Press.
10. Sharma, C. (2016). A critical survey of Indian philosophy. Motilal Banarsidass.
11. Williams, P. (2000). Buddhist thought: A complete introduction to the Indian tradition. Routledge.
12. Bodhi, B. (2000). A comprehensive manual of Abhidhamma: The Abhidhammattha Sangaha of Ācariya Anuruddha. Buddhist Publication Society.
13. Bodhi, B. (Ed.). (2005). In the Buddha's words: An anthology of discourses from the Pāli Canon. Wisdom Publications.
14. Bhikkhu Ñāṇamoli, & Bodhi, B. (Trans.). (1995). The middle length discourses of the Buddha: A new translation of the Majjhima Nikāya. Wisdom Publications.
15. Gombrich, R. F. (2009). What the Buddha thought. Equinox.
16. Kalupahana, D. J. (1992). A history of Buddhist philosophy: Continuities and discontinuities. University of Hawai‘i Press.
17. Lopez, D. S., Jr. (Ed.). (2004). Buddhist scriptures. Penguin Books.
18. Anderson, C. (1999). Pain and its ending: The Four Noble Truths in the Theravāda Buddhist canon. Routledge.
19. Harvey, P. (2000). An introduction to Buddhist ethics: Foundations, values and issues. Cambridge University Press.
20. Siderits, M. (2007). Buddhism as philosophy: An introduction. Ashgate.